মুসলিম দেশে অমুসলিম অধিকার

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

শাইখ মাহমুদুল হাসান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা ও গুণকীর্তন মহান প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। সুখ-শান্তি ও সালামের অবারিত বারিধারা বর্ষিত হোক আল্লাহর বার্তাবাহক সব নবি-রাসূলের ওপর। বিশেষ করে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী প্রত্যেকের ওপর।

গত শতাব্দীতে মুসলিমরা অমুসলিম ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রের নখদন্তের শিকার হয়েছে। তাদের উপনিবেশবাদ দুঃখজনকভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছে মুসলমানদের স্বচ্ছ-সুন্দর ঐতিহ্যমণ্ডিত জীবনধারার গতি। তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সৌধ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারা প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করে এবং পরে সুকৌশলে মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে ঔপনিবেশিক চিন্তাচেতনা, অনৈসলামিক মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি ও রীতিনীতিতে ভরা ভিন্ন ধরনের জীবনব্যবস্থা।

হিংসাশ্রয়ী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল তুলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মুসলিম দেশগুলো ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তখন মুসলমানরা ফিরে পেয়েছে স্বাধীনতা এবং অধিকার। তাদের মধ্যে নতুন করে রব উঠেছে পুনরায় ইসলামে ফিরে যাওয়ার।

ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, বিধিবিধান, রীতিনীতি ও চরিত্র-মাধুর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নবোদ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার অদৃশ্য অনুভূতি প্রচণ্ডভাবে তাদের অন্তরে নাড়া দিয়েছে। মহান প্রভুর দেওয়া জীবনচলার নীতিমালা অনুসরণ করে আপাদমস্তক মুসলমান হওয়ার সুতীব্র প্রেরণা জেগে উঠেছে তাদের মধ্যে।

যদিও তাদের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে কোনো বাধা ছিল না, ছিল না ঔপনিবেশিক শাসনের কোনো কষাঘাত, তথাপি কিছু পশ্চিমা ধারণায় প্রভাবিত বিভ্রান্ত গোষ্ঠী আবিষ্কার করল আরেকটি ছুঁতো ও মিথ্যে অজুহাত। তাদের প্রশ্ন—কুরআনি শাসন কায়েম হলে ইসলামি রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মানুসারী সংখ্যালঘুদের অবস্থা কী হবে? কুরআনি শাসন ও ইসলামের পথে ফিরে যাওয়া কি সেসব অমুসলিম নাগরিকের অধিকারকে খর্ব করবে না? তাদের ধর্মীয় অনুভূতি কি আহত হবে না প্রচণ্ডভাবে?

এ শ্রেণির কথা শুনে মনে হয়, অমুসলিমরা যে যুগ যুগ ধরে ইসলামি শাসনের সুশীতল ছায়ায় শান্তি, আরাম ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছিল, সে কথা তারা বেমালুম ভুলে গেছে। ইসলামি শাসনকালে যদি ঘটনাক্রমে সংখ্যালঘু নির্যাতিত হয়েও থাকে, এতে কিন্তু তারা একা ছিল না; তাদের সঙ্গে বরং তাদের আগে প্রথমেই নিষ্পেষিত হয়েছে মুসলমানরা।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো—তারাই প্রথম ইতিহাস বিকৃতির জন্য নির্লজ্জ হস্ত প্রসারণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তারা ইতিহাসে এমন উদ্ভট মিথ্যে তথ্য সংযোগ করেছে, যা করার সাহস কেউ পূর্বে করেনি। তাদের এ নগ্ন বিকৃতির লক্ষ্য—ইসলাম চিন্তা ও আদর্শে ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে নজিরবিহীন সুন্দর আচরণের যে মহান আদর্শ পেশ করেছে, তা ঘোলাটে করে সরলপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও ধোঁকা দেওয়া।

এজন্যই আমি মুসলিম-অমুসলিম সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের জন্য নিম্ন আলোচনা উপস্থাপন করেছি। যার ভিত্তি জ্ঞান ও গবেষণা, কেন্দ্রবিন্দু ফিকহ ও ইতিহাস। আর এর লক্ষ্য হলো—ভাঙনের পরিবর্তে গঠন, বিচ্ছেদের স্থলে বন্ধন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র, মজবুত ও শক্তিমান দলিলের ভিত্তিতে আমরা এতে আলোচনা করেছি—ইসলামি সমাজে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার কী? সেসব অধিকারের বিনিময়ে তাদের কী দায়দায়িত্ব ও করণীয়? তাদের ওপর প্রদত্ত কর্তব্য সম্পর্কে সৃষ্ট সংশয়ের মূল হেতু কী? অমুসলিমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে কীভাবে আল্লাহ, রাসূল ও মুসলিম মিল্লাতের তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তায় জীবনযাপন করেছিল? এতে আরও স্থান পেয়েছে প্রতিপক্ষের সাথে ইসলামের আচার-ব্যবহার এবং আধুনিক আচার-ব্যবহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা।

আশা করা যায়, এসব তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা শাশ্বত সত্যের অবয়বকে সহজে উদ্ভাসিত করবে। সংশয় ও বিভ্রান্তির নোংরা আবরণকে সজোরে ছিঁড়ে নিক্ষেপ করবে আস্তাকুঁড়ে। এতে থাকবে না পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামির কোনো চিহ্ন। বর্তমানে যখন শ্রেণিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিবর্তে 'সামাজিক শান্তি' ও 'জাতীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে এই লেখাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, সবার বক্ষকে যেন তিনি সত্য উপলব্ধির জন্য উন্মোচিত করে দেন। খোদাপ্রেমের আভায় সবার অন্তঃকরণকে করে দেন আলোকোজ্জ্বল। মারেফত ও বিশ্বাসের আলোয় সকলের বিবেককে প্রদর্শন করেন সরল-সঠিক পথ। নিশ্চয়ই তিনি প্রার্থনা শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী।

ইউসুফ আল কারজাভি

সূচিপত্র

পটভূমি **১৯**

◈ ইসলামি সমাজ পরিচিতি ১৯
◈ অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মূলনীতি ২০
◈ আহলে জিম্মা ২২

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার **২৩**

◈ নিরাপত্তার অধিকার ২৩
◈ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা ২৩
◈ অভ্যন্তরীণ নিপীড়ন থেকে নিরাপত্তা ২৫
◈ দেহ ও রক্তের নিরাপত্তা ২৬
◈ সম্পদের নিরাপত্তা ২৯
◈ মান-মর্যাদার নিরাপত্তা ৩০
◈ দরিদ্র, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের তত্ত্বাবধান ৩১
◈ ধর্মীয় স্বাধীনতা ৩৩
◈ কর্ম ও জীবিকা উপার্জনের স্বাধীনতা ৩৭
◈ বিভিন্ন সরকারি পদে চাকরি ৩৮
◈ অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা ৪১
◈ বিশ্বাসের নিরাপত্তা ৪১
◈ মুসলিম সমাজের জিম্মাদারি ৪২

সংখ্যালঘুদের দায়দায়িত্ব **৪৮**

◈ জিজিয়া ৪৮
◈ জিজিয়া নির্ধারণের কারণ ৫০
◈ জিজিয়া থেকে কখন অব্যাহতি পায় ৫২
◈ বাণিজ্যিক শুল্ক ৫৩
◈ ইসলামি আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ৫৭
◈ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ৫৯

অনুপম উদারতা **৬১**

◈ উদারতার বিভিন্ন স্তর ৬১
◈ মুসলমানদের আন্তরিক উদারতা ৬২
◈ মুসলমানদের উদারনীতির নেপথ্যে ৬৮

ইতিহাসের সাক্ষ্য **৭১**

বিভ্রান্তি দূরীকরণ **৭৬**

- জিজিয়া কর প্রসঙ্গ ৭৬
- সংখ্যালঘুদের ঘাড়ে সিল দেওয়া প্রসঙ্গ ৭৯
- সংখ্যালঘুদের বিশেষ পোশাক ৮০
- খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ঘটনাবলি ৮৩
- কুরআন-সুন্নাহর অর্থ বিকৃতি ৮৬

তুলনামূলক পর্যালোচনা **৯২**

পরিশিষ্ট **১০১**

পটভূমি

ইসলামি সমাজ পরিচিতি

বিশেষ ভাবাদর্শের (Ideology) চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজই ইসলামি সমাজ। এ আদর্শ থেকেই তার তাহজিব-তামাদ্দুন ও নিয়ম-শৃঙ্খলার উৎপত্তি ও বিকাশ। আর এসব ভাবাদর্শ, চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ হচ্ছে ইসলাম। এ কারণে এর নামকরণ হয়েছে ইসলামি সমাজ।

ইসলামি সমাজে জীবন চলার একমাত্র পথনির্দেশক ইসলাম। ব্যষ্টিক, সামষ্টিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামই একচ্ছত্র সংবিধান ও একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু এর মানে এ নয়—ইসলামি সমাজে বসবাসরত অন্য ধর্মাবলম্বীদের নির্মূল করা হবে; বরং ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম সবার মাঝে সৌহার্দ, ন্যায়-ইনসাফ, সদাচরণ ও দয়ার্দ্রতার সুদৃঢ় সেতুবন্ধন গড়ে তোলে; ইসলামপূর্ব মানবসভ্যতা যেটার নজির দেখেনি।

ইসলাম আগমনের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এ সেতুবন্ধন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর অনুপস্থিতির কারণে মানবতা হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। এমনকি আজও এ কারণেই গোটা বিশ্ব দ্বন্দ্বমুখর। সেই সোনালি দিনের পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র প্রকট। পাশাপাশি আধুনিক সমাজব্যবস্থাগুলোতেও সেটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য—কোনো সমাজে কিংবা সময়কালে সেটি আর প্রতিষ্ঠা পায়নি কিংবা পেলেও সেই সোনালি যুগের ধারে-কাছেও তা পৌঁছতে পারেনি। ফলে পৃথিবীর সবখানে প্রবৃত্তি-প্রান্তিকতা, মানবিক সংকীর্ণতা চেপে বসেছে। সৌহার্দপূর্ণ আবহের স্থানে জায়গা পেয়েছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাত। বিরাজ করেছে অব্যাহত বিশৃঙ্খলা, জাতিগত লড়াই, বর্ণযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক ঘাত-অভিঘাত ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মূলনীতি

অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের মূলনীতি নির্দেশ করে আল্লাহ বলেন—

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

‘যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করে না এবং তোমাদের বহিষ্কার করে না আপন বাস্তুভিটা থেকে, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ প্রদর্শনে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। অবশ্য যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তোমাদের এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন। যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, বস্তুত তারাই অত্যাচারী-জালিম।’[১]

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং সবার জন্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের অবশ্যপালনীয় দ্বীনি দায়িত্ব। যতদিন তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ও আক্রমণ থেকে দূরে থাকে—যদিও তারা হয় কাফির ও ভিন্ন মতাদর্শী।

---

[১] সূরা মুমতাহিনা : ৮-৯

অমুসলিমদের মধ্যে আহলে কিতাবদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান আরও উদার। প্রসঙ্গত, আহলে কিতাব বলতে বোঝায়, যাদের ধর্মবিশ্বাস কোনো আসমানি কিতাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যদিও পরবর্তী সময়ে তা হয় বিকৃত। যেমন : ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মের মূলে ছিল তাওরাত ও ইনজিল। তাই পবিত্র কুরআন তাদের সঙ্গে মার্জিত ও শালীনভাবে ছাড়া ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যেন তাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বহ্নিশিখা জ্বলে না ওঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ-

‘আহলে কিতাবদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হবে না উত্তম পন্থা ছাড়া। তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে, তাদের সঙ্গে নয়। তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের প্রতি। আমাদের উপাস্য এবং তোমাদের উপাস্য একই। আমরা তাঁরই একান্ত অনুগত।’[২]

ইসলাম আহলে কিতাবদের খাবারদাবার ও তাদের জবাইকৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। আরও অনুমতি দিয়েছে—তাদের সতী ও পবিত্র নারীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের। অথচ কুরআনের ভাষায় দাম্পত্য জীবন হলো— সুনিবিড় ভালোবাসা ও গভীর সহানুভূতিপূর্ণ এক সম্পর্কের নাম। আল্লাহ বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

‘তার আরও এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।’[৩]

এটা ইসলামি উদারতার অনুপম দৃষ্টান্ত। ইসলাম মুসলিম পরিবারের দায়িত্ব একজন অমুসলিম নারীর হাতে সোপর্দ করার পথ খোলা রেখেছে। সুযোগ রেখেছে একজন মুসলিম যুবকের জীবনসঙ্গিনী ও তার সন্তান-সন্ততির মায়ের মর্যাদায় বিধর্মী নারীকে সমাসীন করার। এভাবে মুসলমানদের প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নানা-নানি ও মামা-খালা ভিন্নধর্মাবলম্বীরা হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন—

---

[২] সূরা আনকাবুত : ৪৬

[৩] সূরা রুম : ২১

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ-

'আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য, তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। ঈমানদার সতী-সাধ্বী নারী আর তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বী নারীরা তোমাদের জন্য বৈধ। যদি তোমরা কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য ও গোপন-অবৈধ বন্ধুত্বের জন্য নয়; বরং যথাযথ প্রাপ্য (মোহর) দিয়ে সঠিকভাবে তাদের গ্রহণ করো।'[৪]

এ বিধান সব আহলে কিতাবের জন্য প্রযোজ্য, যদিও তারা অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়। তবে যারা মুসলিম প্রজাতন্ত্রের নাগরিক, তাদের জন্য আরও অধিক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ রয়েছে। তারাই হলো শরিয়ার পরিভাষায় 'আহলুজ জিম্মা'। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে—আহলে জিম্মার বিস্তারিত পরিচিতি কী?

আহলে জিম্মা

ইসলামি পরিভাষায় মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিমদের ক্ষেত্রে আহলে জিম্মা বা জিম্মি দুটি শব্দই প্রচলিত। জিম্মা শব্দের অর্থ অঙ্গীকার, নিরাপত্তা ও দায়িত্ব। এই নামকরণের রহস্য হলো–আল্লাহ, রাসূল ও মুসলিম জামায়াতের সঙ্গে তাদের চুক্তি রয়েছে। আর সেই চুক্তির ভিত্তিতে তারা ইসলামি রাষ্ট্রে নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করবে। মুসলমানরা তাদের দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে থাকবে।

আধুনিক যুগে নাগরিকত্ব (Citizenship) প্রাপ্তির কারণে যেমন অন্যান্য নাগরিকের মতো সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করা যায়, 'জিম্মা' চুক্তির কারণেও অমুসলিমরা মুসলমানদের মতো সব অধিকার ভোগ করে থাকে।

সুতরাং জিম্মিকে ফকিহদের পরিভাষায় 'ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী'[৫] এবং আধুনিক পরিভাষায় 'ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক' বলা যায়।[৬]

বস্তুত জিম্মা কোনো সাময়িক চুক্তি নয়। এটি সদা চলমান এমন চুক্তি, যার ফলে তারা অবাধে নিজ ধর্মমত পালন করতে পারে। ভোগ করে মুসলিমদের মতো সব ধরনের সুরক্ষা সুবিধাও। শর্ত হলো—তারা ইসলামি সরকারকে জিজিয়া বা কর দেবে এবং ধর্মীয় বিষয় ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান আনুগত্য করবে। অতএব, এসবের মাধ্যমে তারা 'ইসলামি দেশের অধিবাসী'-তে পরিণত হবে।

জিম্মা চুক্তি মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে। সে দায়িত্বগুলোই আমাদের এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়।

---

[৪] সূরা মায়েদা : ০৫

[৫] সারাখসি, *শরহু সিয়ারিল কাবির* : ০১/১৪০; আল কাসানি, *আল বাদায়িউস সানায়ি* : ০৫/২৮১; ইবনে কুদামা, *আল মুগনি* : ০৫/৫১৬

[৬] শহিদ আবদুল কাদির আল আওদা, *আত-তাশরিউল জানাই আল ইসলামি* : ০১/৩০৭; ড. আবদুল কারিম জায়দান, *আহকামুজ জিম্মিয়্যিন ফি দারিল ইসলাম* : ৬৩-৬৬

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো—বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া তারা মুসলমানদের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। একইভাবে মুসলমানদের মতো তাদেরও দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে হবে।

নিরাপত্তার অধিকার

তাদের সর্বপ্রথম অধিকার হলো—ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। এ নিরাপত্তার আওতায় অভ্যন্তরীণ শোষণ, জুলুম, নির্যাতন, উত্ত্যক্তকরণ ও বৈষম্য থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত থাকবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষার বিষয়টিও। যেন তারা সম্পূর্ণ নিরাপদে স্থিতিশীলতার সঙ্গে বসবাস করতে পারে।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা

মুসলমানরা বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের প্রতিহত করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনি জিম্মিরা আক্রান্ত হলে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইসলামি সরকারের জন্য আবশ্যক। সামরিক শক্তি ব্যয়ে হোক কিংবা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশলে, তাদের নিরাপত্তা কোনোভাবেই বিঘ্নিত করা যাবে না।

হাম্বলি মাজহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ *মাতালিবু উলিন নুহা*-তে উল্লেখ আছে—

> ‘রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো—অমুসলিম নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া। তাদের উত্ত্যক্তকারীদের প্রতিহত করা ও বন্দিদের মুক্তি দেওয়া। তাদের অনিষ্টকামীদের প্রতিরোধ করা—যদিও তারা মুসলিম দেশে বসবাসকারী হয়।’

কারণ, মুসলমানদের সঙ্গে তাদের চুক্তিটি একটি স্থায়ী চুক্তি। সুতরাং মুসলমানদের রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ কর্তব্য, অমুসলিমদের রক্ষার জন্যও তা গ্রহণ করা আবশ্যক।[৭]

ইমাম কুরাফি আল মালেকি তাঁর রচিত *আল ফুরুক* গ্রন্থে ইমাম ইবনে হাজম আজ-জাহেরি রচিত *মারাতিবুল ইজমা* থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন—‘আমাদের জিম্মায় থাকা অমুসলিম নাগরিকের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হলে, পূর্ণ সামরিক শক্তি ব্যবহার করে আমরণ যুদ্ধ করে হলেও জিম্মিদের সুরক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আর এটি করা হবে আল্লাহ ও তাঁর

[৭] খণ্ড : ০২, পৃষ্ঠা : ৬০২-৬০৩

রাসূলের অঙ্গীকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। যদি তাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা ও জিম্মা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।'[৮]

এ বিষয়ে তিনি পুরো মুসলিম মিল্লাতের ইজমার কথাও উল্লেখ করেন। এরপর ইমাম কুরাফি নিজের মন্তব্যে লেখেন—

'যে চুক্তি রক্ষার্থে জানমাল বিসর্জন দিতে হয়, তা নিশ্চয়ই অনেক বড়ো চুক্তি।'[৯]

ইসলামের এই সাম্প্রদায়িক উদারতার যথাযথ বাস্তবায়ন ফুটে উঠেছে বিশিষ্ট ফকিহ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার সুদৃঢ় অবস্থানের মাধ্যমে। তাতারিরা সিরিয়া দখল করে নিলে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ইবনে তাইমিয়া তাতার সম্রাট কাজানের দরবারে উপস্থিত হন। তাতারি নেতা মুসলিম বন্দিদের মুক্তি দিতে সম্মত হলেও অমুসলিমদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করেন।

শাইখ ইবনে তাইমিয়া প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ সব বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। স্বধর্মী-বিধর্মী কাউকেই আমরা বন্দি হিসেবে রেখে যেতে পারি না।' শাইখের এমন অবিচল অবস্থান ও দৃঢ়তা দেখে সম্রাট কাজান সবাইকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

অভ্যন্তরীণ নিপীড়ন থেকে নিরাপত্তা

অভ্যন্তরীণ জুলুম-নিপীড়ন থেকে অমুসলিমদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কঠোর। মুসলমানদের ভাষা ও আচরণে তারা যেন বিক্ষুব্ধ না হয় এবং কষ্ট না পায়, সেজন্য মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে ইহ ও পরকালীন শাস্তির ভয়। ইসলামের ভাষ্য হলো—যারা সংখ্যালঘুদের জ্বালাতন করবে, তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে। আল্লাহর নিকট তারা হবে অপ্রিয় ও ঘৃণিত।

যারা সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে, তাদের সংক্রান্ত বিশেষায়িত কিছু হাদিসও রয়েছে। নবি (সা.) বলেছেন—

'কোনো সংখ্যালঘুর ওপর কেউ যদি অত্যাচার করে, তার অধিকার ক্ষুণ্ন করে কিংবা তাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করায়, অথবা তার অমতে কিছু কেড়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব।'[১০]

তিনি আরও বলেন—

'যে ব্যক্তি কোনো জিম্মিকে কষ্ট দেবে, আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হব। আর আমি কারও বিরুদ্ধে বাদী হলে নিশ্চয়ই বিজয়ী হব আমিই।'[১১]

তিনি অন্যত্র বলেন—

---

[৮] *আল ফুরুক*, খণ্ড : ০৩, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫

[৯] প্রাগুক্ত

[১০] ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকি, *সুনানে কুবরা*, খণ্ড : ০৫, পৃষ্ঠা : ২০৫

[১১] সনদে হাসানসহ খতিব বর্ণনা করেন।

'যে ব্যক্তি কোনো জিম্মিকে উত্ত্যক্ত করল, সে যেন উত্ত্যক্ত করল আমাকেই। আর যে আমাকে উত্ত্যক্ত করল, সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিলো!'[১২]

নাজরানের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের সঙ্গে নবিজির স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিল—

'একজনের অপরাধের প্রতিশোধ অন্যজন থেকে নেওয়া হবে না।'[১৩]

এ কারণেই খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ থেকে মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা রয়েছে। তাদের প্রত্যেক অভিযোগের সঠিক তদন্তের ব্যাপারে মুসলমানরা সর্বদা সজাগ ও সচেষ্ট ছিল।

উমর (রা.)-এর কাছে দূরদূরান্ত থেকে কোনো প্রতিনিধি এলে প্রথমে কোনো মুসলমান তাদের কষ্ট দিচ্ছে কি না, এ ভয়ে তিনি সর্বদা শঙ্কিত থাকতেন। উত্তরে তারা জানাত, আমরা এ ব্যাপারে কোনো সম্প্রীতি নষ্টকারীর ঘটনা শুনিনি।[১৪] অর্থাৎ তাদের পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি অটুট রয়েছে।

আলি (রা.) বলতেন—

'তারা আমাদের জিজিয়া প্রদান করে, যাতে তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো এবং তাদের প্রাণ আমাদের প্রাণের মতো সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে।'[১৫]

সব মাজহাবের ফকিহগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো—সংখ্যালঘুদের ধন-প্রাণের হেফাজত করতে হবে। আর কঠোরভাবে দমন করতে হবে তাদের ওপর অত্যাচারকারীদের। তাদের সব ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করা ওই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত, যা তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে। অনেক ফকিহের মতে, অমুসলিমকে নির্যাতন করা মুসলমানের ওপর নির্যাতন করা অপেক্ষাও অধিক ঘৃণ্য ও জঘন্য।[১৬]

দেহ ও রক্তের নিরাপত্তা

অমুসলিম নাগরিকদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ও আবরুর নিরাপত্তা যেমন তাদের অধিকার, তেমনি অধিকার দেহ, রক্ত ও আত্মার নিরাপত্তাও। সব মাজহাবের ইমামদের ঐকমত্যে অমুসলিম নাগরিকের খুন-রক্ত নিষ্পাপ এবং তাদের হত্যা করা মহাপাপ। নবিজি ইরশাদ করেছেন—

'যে সংখ্যালঘুকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ বেহেশতের সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে ৪০ বছরের দূরত্বে থেকেও।'[১৭]

এজন্য ফকিহদের সম্মিলিত রায় হলো—হাদিসের এই সতর্কবাণীর কারণে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা জঘন্য পাপ ও কবিরা গুনাহ। তবে যদি মুসলমানদের কেউ কোনো সংখ্যালঘুকে হত্যা করে, তাহলে শাস্তি হিসেবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে।

---

[১২] তাবরানি *আওসাত* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[১৩] *কিতাবুল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ৭২-৭৩

[১৪] *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ০৪, পৃষ্ঠা : ২১৮

[১৫] *আল মুগনি*, খণ্ড : ০৮, পৃষ্ঠা : ৪১৫; *আল বাদায়ি*, খণ্ড : ০৭, পৃষ্ঠা : ১১১

[১৬] মাসয়ালাটি *ফাতাওয়া শামি*-তে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো—ইসলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা সাধারণত দুর্বল হয়ে থাকে। আর সবল দুর্বলকে অত্যাচার করা অধিক জঘন্য।

[১৭] সহিহ বুখারি, মুসনাদ আহমাদ, সুনানে নাসায়ি, সুনানে ইবনে মাজাহ

ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতে, হত্যাকারী মুসলিমকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না। তাদের দলিল হলো—

'কাফিরের হত্যার প্রতিশোধে মুসলমানকে পালটা হত্যা করা হবে না।'[১৮]

ইমাম মালেক ও লাইস (রহ.)-এর অভিমত হলো—যদি কোনো মুসলিম কোনো সংখ্যালঘুকে অতর্কিত হামলা করে হত্যা করে, তবে পালটা হত্যার মাধ্যমে তার বিচার করা হবে। আর যদি অতর্কিত হত্যা না করে, তাহলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।[১৯]

কারণ, আবানা বিন উসমান (রা.) মদিনার প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকালে একটি মামলায় এ ধরনের রায় দিয়েছেন। সে মামলায় একজন মুসলমান এক কিবতিকে অতর্কিত হত্যা করেছিল। আর আবানা (রা.) ছিলেন মদিনার শীর্ষস্থানীয় একজন ফকিহ।[২০]

ইমাম শাবি, নাখয়ি, ইবনে আবি লায়লা, উসমান আল বাত্তি, ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহচরদের অভিমত হলো—কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত 'কিসাস' (মৃত্যুদণ্ড)-এর বিধান ব্যাপক এবং এটি বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত না হওয়ায় মুসলমানকেও সংখ্যালঘু হত্যার দায়ে হত্যা করা হবে। তা ছাড়া তাদের রক্ত ও খুনের মর্যাদা মুসলমানদের রক্তের মতোই। সুতরাং উভয়ের হত্যা সমান অপরাধ।

প্রিয় নবিজি একজন অমুসলিম নাগরিকের হত্যার বিচারে মুসলমানকেও হত্যা করেছেন এবং হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যা করে বলেছেন—

'আমি অঙ্গীকার রক্ষাকারীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।'[২১]

আলি (রা.)-এর আদালতে অমুসলিম হত্যাকারী একজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে উপস্থিত করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিতও হয়। তিনি তাকে হত্যা করার রায় দেন। লোকটিকে হত্যা করা হবে—এমন সময়ে নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বলল—'আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

আলি (রা.) তাকে প্রশ্ন করলেন—'হয়তো তারা তোমাকে চোখ রাঙিয়েছে, হুমকি দিয়েছে, তাই তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষমা করে দিচ্ছ?'

উত্তরে লোকটি বলল—'না, হত্যাটি ছিল অনিচ্ছাকৃত। তারা আমাকে রক্তপণ (দিয়াত) দিয়েছে। আমি এতেই সন্তুষ্ট।' আলি (রা.) বললেন—নিশ্চয়ই তুমি জানো, যারা আমাদের নিরাপত্তায় থাকবে তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো। তাদের হত্যার রক্তপণ (দিয়াত) আমাদের হত্যার রক্তপণের মতোই।'[২২]

অন্য বর্ণনা অনুযায়ী আলি (রা.) বলেন—'নিশ্চয়ই তারা আমাদের জিজিয়া প্রদান করেছে, যেন তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো নিরাপদ হয়।'

---

[১৮] সহিহ বুখারি, সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিজি, সুনানে নাসায়ি, মুসনাদ আহমাদ

[১৯] *নাইলুল আওতার*, খণ্ড : ০৭, পৃষ্ঠা : ১৫৪

[২০] *সুনানে কুবরা*, খণ্ড : ০৮, পৃষ্ঠা : ৩৪

[২১] *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*, সুনানে বায়হাকি

[২২] *সুনানে কুবরা*, খণ্ড : ৮ম, পৃষ্ঠা : ৩৪

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জনৈক মুসলিম কর্তৃক অমুসলিমকে হত্যা প্রসঙ্গে জনৈক প্রশাসকের নিকট পত্র মারফত নির্দেশ দিয়েছেন, যেন হত্যাকারীকে নিহতের অভিভাবকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিভাবকরা চাইলে হত্যার প্রতিশোধ নেবেন কিংবা ক্ষমা করে দেবেন। নির্দেশ মোতাবেক অভিভাবকের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হলে অভিভাবকরা তার শিরশ্ছেদ করেছিল।[২৩]

মুসলিম হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে এ মতাবলম্বী ফকিহগণ আরও বলেন—'সংখ্যালঘু নাগরিকের সম্পদ চুরি করলে শাস্তি হিসেবে মুসলমানের হাত কেটে দেওয়া হয়। তাহলে তাকে হত্যা করলে কেন সমদণ্ড দেওয়া হবে না? তবে কি প্রাণের চেয়ে ধনের মূল্য বেশি?'

আর হাদিসের ভাষ্য—'কাফিরের হত্যার প্রতিশোধে মুসলমানকে পালটা হত্যা করা যাবে না।' এখানে কাফির বলতে অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিককে হত্যার কথা বলা হয়েছে; মুসলিম সমাজে বৈধভাবে বসবাসকারী জিম্মিকে বোঝানো হয়নি। এ ব্যাখ্যানুসারে সব আয়াত ও হাদিসের মধ্যে সুসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪]

গত শতাব্দীতে ইসলামের শত্রুদের গোপন ষড়যন্ত্রে উসমানি খিলাফতের পতন ঘটে। এর আগপর্যন্ত যুগ যুগ ধরে হানাফি ফকিহদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই এ সংক্রান্ত মামলার সমাধান দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম তাদের আত্মার নিরাপত্তা দিয়েছে। দিয়েছে দৈহিক নিরাপত্তাও। এ কারণে বিনা দণ্ডণীয় অপরাধে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা যাবে না। এমনকি তারা যদি জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে তবুও। অথচ কোনো মুসলমান জাকাত দিতে অস্বীকার করলে ইসলাম কিন্তু তার সাথে কঠোরতা অবলম্বন করেছে।

ফকিহগণ অমুসলিমদের কারাদণ্ডের ঊর্ধ্বে আর কোনো শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেয়নি। তাও আবার বিনাশ্রম কারাদণ্ড। এ প্রসঙ্গে হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) লেখেন—

হাকিম বিন হিশাম নামক জনৈক সাহাবি হিমসে গিয়ে দেখলেন, জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করতে জিম্মিদের প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এটা দেখে তিনি বললেন, তোমরা এটা কী করছ? আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি—

> 'যারা পৃথিবীতে মানুষকে শাস্তি দেয়, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন।'[২৫]

আলি (রা.) খাজনা আদায় প্রসঙ্গে জনৈক গভর্নরের কাছে পত্র মারফত নির্দেশ দেন—

> 'তাদের কাছে খাজনা উশুলের জন্য গিয়ে তাদের শীত বা গরমকালীন বস্ত্র, জীবিকা উপার্জনের উপকরণ, চাষের জন্তু ইত্যাদি বিক্রয় করে দেবে না। তাদের বেত্রাঘাত করবে

---

[২৩] *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১০১-১০২

[২৪] *আহকামুল কুরআন*, ইমাম জাসসাস, পৃষ্ঠা : ১৪০-১৪৪

[২৫] *আল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ২০৫; *সুনানে কুবরা*, খণ্ড : ০৯, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬; মুসনাদে আহমাদ : ১৫৩৩১; *তাবরানি* : ২২/৪৩৮

না। বিক্রয় করবে না তাদের কোনো সম্পদ। আমাদের দায়িত্ব হলো—তাদের উদ্বৃত্ত গ্রহণ করা। যদি নির্দেশ লঙ্ঘন করো, আমার পূর্বে আল্লাহই তোমাকে শাস্তি দেবেন। আর নির্দেশ অমান্য করার সংবাদ আমার কর্ণগোচর হলে আমি নিশ্চিত তোমাকে বরখাস্ত করব।'[২৬]

সম্পদের নিরাপত্তা

দেহ ও আত্মার নিরাপত্তার পাশাপাশি সম্পদের নিরাপত্তাও জিম্মিদের জন্য স্বীকৃত একটি অধিকার। এটা সর্বযুগের, সর্বস্থানের সব ইমামের সম্মিলিত মত। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) *আল খারাজ* গ্রন্থে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবিজি নাজরানের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন—

'নাজরান ও তৎসংশ্লিষ্টদের জন্য রয়েছে আল্লাহর আশ্রয় এবং তারা রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের ধর্মকর্মে, ধনসম্পদে ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।[২৭]

বিশিষ্ট সেনানায়ক আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে উমর (রা.) পত্র মারফত নির্দেশ দিয়েছেন—

'তাদের প্রতি অত্যাচার করা থেকে, তাদের কোণঠাসা করা থেকে এবং তাদের সম্পদ অবৈধ ভোগদখল করা থেকে মুসলমানদের বারণ করো।'

এ প্রসঙ্গে আলি (রা.) বলেছেন—

'তারা আমাদের জিজিয়া প্রদান করেছে, যেন তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়।'

এ ভিত্তিতেই মুসলমানদের কার্যধারা সর্বযুগে চলে আসছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সংখ্যালঘুর সম্পদ চুরি করবে, শাস্তি হিসেবে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। যে ছিনতাই করবে, তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে এবং সম্পদ ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে। যে ব্যক্তি তার থেকে ঋণ নেবে, অবশ্যই তাকে তা পরিশোধ করতে হবে। যদি ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অযথা কালক্ষেপণ করে বা টালবাহানা করে, তাহলে প্রশাসক তাকে গ্রেফতার করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দেবে। নচেৎ ঋণ পরিশোধ করার আগপর্যন্ত তাকে কারাগারে আটকে রাখবে।

ইসলামের উল্লেখযোগ্য আরেকটি উদারতা হলো—যেসব সম্পদ ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ, অমুসলিমদের এ ধরনের সম্পদও ধ্বংস করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। যেমন : মদ ও শূকর। কোনো মুসলমানের কাছে এসব সম্পদ সংরক্ষিত থাকতে পারে না। নিজে ব্যবহারের জন্যও নয়, বিক্রয়ের জন্যও নয়। কোনো মুসলিমের মালিকানায় থাকলে অন্য কোনো মুসলমান যদি তা বিনষ্ট করে দেয়, তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু কোনো অমুসলিমের এসব সম্পদ নষ্ট করা হলে অবশ্যই তাকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হানাফি ফকিহগণ এমনটাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[২৮]

---

[২৬] *আল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬; *সুনানে কুবরা*, খণ্ড :০৯, পৃষ্ঠা : ২০৫

[২৭] *আল খারাজ*, পৃষ্ঠা : ৭২

[২৮] এ বিষয়ে ফকিহদের মতবিরোধ আছে। উল্লিখিত মতটি হানাফি ফিকহবিশারদদের মত।